ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607017

নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রিক ভাবাদর্শ বনাম সম্পাদকের দায়: সিকান্‌দার আবু জাফরের *সমকাল*

মো. সোহানুজ্জামান*

Abstract: Nationalist political events and activities played an important role in the formation of the state of Bangladesh. Similarly, the contributions of the country's art, literature, and cultural sphere—as well as the key figures within these domains—were also of significant importance. Among those who played a vital role in the creation of the state beyond the defined political events and activities was Sikander Abu Zafar and the literary magazine *Samakal*, which he founded. This research paper aims to analyze *Samakal* in order to assess how the world of art, literature, and culture actively responded to and resisted the oppressive state ideology of Pakistan and contributed to the creation of the new nation.

মুখ্যশব্দ: সমকাল, রাষ্ট্রিক ভাবাদর্শ দায়, সম্পাদকের, পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামো

১.

চল্লিশের দশকে বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস-বিবেচনায় কেবল নয়, সামগ্রিক অর্থে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার বিবেচনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯১৯–১৯৭৫)। তিনি যতটা তাঁর কবিতার জন্য পরিচিত, ঠিক ততটাই কিংবা তার চেয়েও যেন বেশি পরিচিত তাঁর সম্পাদিত *সমকাল* পত্রিকার জন্য– এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। বলা যেতে পারে, সিকান্‌দার আবু জাফরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকা' (সিকান্‌দার, ১৯৯৫, পৃ. ৪)। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিবেচনায় দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার ঐতিহাসিক মান বিবেচনায় *সমকাল* পত্রিকার সমমানের পত্রিকার নিদর্শনও বেশ দুর্লভ। *সমকাল* সিকান্‌দার আবু জাফরের জন্য কেবল একটি মাইলফলক নয়, বরঞ্চ বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক-জগতের পাটাতন নির্মাণেও সবিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল এই পত্রিকা। 'এই পত্রিকায় সিকান্‌দার আবু জাফর যা করেছিলেন তা হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতিকে সামগ্রিকভাবে ধারণ' (সিকান্‌দার, ১৯৯৫, পৃ. ৪), যা কার্যত এখনো

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রে সক্রিয় রয়েছে এবং শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক জগতে তা অনুসরণ করা হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে।

সমকাল প্রকাশিত হয়েছিল একটি মাসিক পত্রিকারূপে, কিন্তু নানা জটিলতায় প্রত্যেক মাসে পত্রিকা প্রকাশিত হতে পারেনি। *সমকাল* পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে; তৎকালীন পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খানের জারিকৃত সামরিক শাসন সূচনার বছরখানেক পূর্বে। এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার পূর্বে যদিও বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের মতো রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে গেছে। *সমকাল* পত্রিকা সিকান্‌দার আবু জাফরের হাতে ১৪ বছর সম্পাদিত হয়ে ৯০-এর অধিক সংখ্যা বের হয়েছিল (সিকান্‌দার, ১৯৯৭, পৃ. ৪৩৬)। সিকান্‌দার আবু জাফরের সম্পাদনাকালে এই পত্রিকাটির সহকারী সম্পাদক হিসেবে ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। পত্রিকাটির প্রুফ সংশোধক ছিলেন সেই সময়ের তরুণ কবি আল মাহমুদ। দেশ-কাল-সমাজ-রাষ্ট্রের বিবেচনায় ঐতিহাসিকভাবে কিংবা রাজনৈতিক বিবেচনায় এই সময়কালের যে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি, তা নানার্থেই আলোড়নপ্রবণ।

সিকান্‌দার আবু জাফরের মৃত্যুর পর এই পত্রিকার হাল ধরেছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। সিকান্‌দার আবু জাফর *সমকাল* পত্রিকা সম্পাদনার পূর্বে অবিভক্ত বাংলার অনেকগুলো প্রসিদ্ধ পত্রিকা সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, যা তাঁর *সমকাল* পত্রিকা সম্পাদনার জন্য সহায় হয়েছিল নিশ্চয়। তিনি দেশভাগ পূর্ববর্তী সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম ও কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমেদ সম্পাদিত *দৈনিক নবযুগের* মতো বিখ্যাত পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। দেশভাগের পর তিনি ঢাকায় এসে *দৈনিক সংবাদ* ও *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় কাজ শুরু করেন। 'দৈনিক 'সংবাদ'-এর প্রথম সম্পাদকীয় তাঁরই লেখা' (মাহবুবা, ১৯৯৩, পৃ. ১১)। তবে সেই সময়ের তরুণ কবি হাসান হাফিজুর রহমান ও বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর *সমকাল* পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ বিষয়ে সিকান্‌দার আবু জাফর যা বলেছেন তা নিম্নরূপ:

> যাই হোক, সাপ্তাহিক বার করবার চিন্তা করেছিলাম– সেই সময়ে হাসান এবং বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর দু'জনে এসে আমাকে সাহিত্য মাসিক বার করবার অনুরোধ জানালো। আমি রাজি হয়ে গেলাম। নাম ওরাই ঠিক করেছিল 'সমকাল'। যথাসময়ে ডিক্লারেশান নেওয়া হল। আমার প্রকাশনা এবং একক মালিকানা। পত্রিকা ছাপা হবে আল-হেলাল প্রেস থেকে। কুখ্যাত হামিদুল হক চৌধুরীর প্রেস। তবু আবদুল গণি হাজারীর জন্যে ওখানেই গেলাম। এক মাসের টাকা অগ্রিম দিতে হলো। সেটা ১৯৫৬ সালের অক্টোবর। কাগজ বার হবে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে (অলীউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৬২)।

একটি প্রকাশনা সংস্থাও তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যা ‘এ ‘সমকাল’ পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে ‘সমকাল মুদ্রায়ণ’ ও ‘সমকাল প্রকাশনী’ গড়ে ওঠে’ (মাহবুবা, ১৯৯৩, পৃ. ১১)। *সমকাল*– এই নামটি নেওয়া হয়েছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পাদিত ইংরেজি ভাষার সাহিত্য পত্রিকা *The Contemporary*-থেকে। *সমকাল* প্রকাশিত হওয়ার পরপরই এই পত্রিকাকে ঘিরে নানা রকম আলোচনা-সমালোচনা হতে থাকে। ইতিবাচক মন্তব্য যেমন ছিল, তেমনি ছিল নানা রকম নেতিবাচক মন্তব্য। কিন্তু সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে রাগান্বিত মন্তব্যের বিপরীতে কৌশলগত অবস্থান থেকে দারুণ মিঠাকড়া প্রতিবাদ তিনি লিখেছিলেন পরবর্তী সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে–

> সমকালের লেখকগোষ্ঠী সম্বন্ধে কোনো কোনো মহলের আলাপ-আলোচনা আমাদের কানে এসেছে। এই আলোচনা প্রধানত ‘রঙ নির্ণয়’ সম্বন্ধে। অর্থাৎ অমুক লেখক ‘লাল’, অমুক লেখক ‘সবুজ’, অমুক ‘ঈষৎ লাল’ ইত্যাদি। বর্ণ নির্ণয় যাদের সমালোচনার মাপকাঠি তারা নিজেরা বর্ণচোরা না হলে পুরোপুরি লাল হয়ে যেতেন। কারণ ‘পাকামির’ পরিণতি তো লালই। অর্থাৎ পেকে তো লাল হয়, অবশ্য ‘ইঁচড়ে পাকা’ না হলে। ... এঁদের চোখে ফুঠে ওঠে ‘সাতরঙ’ নয় ‘এক রঙের’ রঙধনু। এই বর্ণনাতীত ব্যাপারে আমাদের কোনো কৌতূহল নেই। বর্ণ-বৈষম্যের ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক লেখক নিয়ে গোষ্ঠী তৈরিও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ‘সমকাল’-এর পাতায় আমরা তাদের নিয়েই আসর জমাবো, যারা বর্ণের বারবরদার নন, সত্যিকার বার্ণিক (অলিউল্লাহ্, ২০১৩, পৃ. ৬৪)।

সমকাল একটি উন্নতমানের রুচিশীল পত্রিকারূপে গণ্য হতো সে সময়। এর প্রচ্ছদ-শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, রশীদ চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, দেবদাস চক্রবর্তী, মুকতাদির ও নিতুন কুন্ডুর মতো খ্যাতিমান শিল্পীরা (রবিউল, ২০১৫, পৃ. ৪৪)।

২.

উনিশ শতক থেকেই পূর্ববাংলার জনমানসের ভেতর থেকে শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিকবোধের বিষয় একটু ধীরগতিতে সক্রিয় থাকলেও তা একার্থে জায়মানই ছিল বটে। ‘১৯৪৭-এর পূর্ববর্তী কালে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা’ (ইসরাইল, ১৯৯৯, পৃ. ১)। ফলে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিনির্ভর পত্র-পত্রিকার কেন্দ্রও সেই সময় কলকাতাই বটে। কিন্তু এই পত্র-পত্রিকা নির্ভর নবজাগরণের নানা সমালোচনা করা সম্ভব। বিশেষ করে উনিশ শতকে কলকাতায় যে নবজাগরণ সংঘটিত হয়েছিল, তা অনেকাংশেই পত্র-পত্রিকানির্ভর শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। কারণ বাংলা অঞ্চলের নবজাগরণে

যান্ত্রিক কিংবা প্রযুক্তিগত শিল্পায়ন ব্যাপারটা প্রায় ঘটেইনি। তারপরও এই বিশেষ অঞ্চলকেন্দ্রিক নবজাগরণের ঋণ বর্তমানে এসেও অস্বীকার করার কোনো উপায় আমাদের নেই। কিন্তু পূর্ববাংলা সম্পর্কে পূর্বোক্ত পরিস্থিতি উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকেই একটু-একটু করে উন্নত হতে থাকে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে তা পরিণতি লাভ করে। কিন্তু দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত এই ধারা আর ধারণায় প্রকাশিত সমস্ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা এককেন্দ্রিক ধারণার ভেতরেই প্রকাশিত হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাঙালী মুসলমানের ইতিহাসচর্চা ইসলাম জগৎ-কেন্দ্রিক ছিল। এর বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত নিরুৎসাহী। "ব্রহ্মরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস", "জাভার বিবরণ", "মার্টিন লুথার" কিংবা "ফ্রেডারিক লিস্ট ও তৎকালীন জার্মানী" প্রভৃতি রচনার কথা মনে রেখেও একথা বলা যায়। বাঙালী মুসলমানের বর্ণিত ইতিহাস একদিকে ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও উপাখ্যানধর্মী; অন্যদিকে সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় মুসলমানের অবদান তাঁরা সন্ধান করেছিলেন, তবে সে অনুসন্ধান সর্বত্র বিশ্বপটভূমিকায় স্থাপিত হয়নি (আনিসুজ্জামান, ১৯৬৯, পৃ. ৩৪)।

আনিসুজ্জামানের এই উক্তি অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের ভেতরে প্রকাশিত চিন্তা-আদর্শ ধারণ করে এমন লোকজনের লেখালেখি কিংবা সেই সময়কার বাস্তবতাকে প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং এই বিষয়ে সমালোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, সেই সময়কার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোয় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এমন ঘটনা সংঘটিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। আবেগীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে কোনো সময় যে কোনো কিছু ঘটাতে পারে। তার অসংখ্য উদাহরণ এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস-বিবেচনায় উদাহরণ হিসেবে হাজির করা সম্ভব। বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎও এই ধারণার বাইরে নয়।

দেশভাগ পূর্বকালেই এই জায়মানতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল ঢাকা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিখা-গোষ্ঠীর মুখপত্র *শিখা* পত্রিকাকে ঘিরে, যা কলকাতার নবজাগরণের বর্ধিত রূপ বা 'দ্বিতীয় ঢেউ' হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ কলকাতায় সৃষ্ট উনিশ শতকের 'উদারনৈতিকতা', 'মানবতাবাদ' ও 'আধুনিকতার' মতো বিমূর্ত ধারণা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নানা বিবেচনায় এই অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মানুষের অন্তরাত্মায় আবদ্ধ ছিল। পূর্ববাংলায় নতুন সৃষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরপরই নতুন বৌদ্ধিক পরিসর সৃষ্টি হলে বিষয়টি এই অঞ্চলের মানুষ একটি বৌদ্ধিক আন্দোলনেই রূপ দিয়েছিল। এর ফলাফল এই অঞ্চলের মানুষ ভোগ কিংবা উপভোগ–যাই বলি না কেন, আজ অবধি তা করছে।

শিখা পত্রিকার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ছিল *সমকাল*। *কণ্ঠস্বর*, *স্বাক্ষর*, *পূর্বমেঘ* যদিও আধুনিকতাবাদী সাহিত্যান্দোলনের চরম পর্যায় নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে তার সূচনাবিন্দু স্থির হয়ে আছে *সমকাল* পত্রিকার অন্দরে। এবং ষাটের দশকের *কণ্ঠস্বর*, *স্বাক্ষর*, *পূর্বমেঘ* পত্রিকাসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট সাহিত্য-নন্দনতত্ত্বকে আদর্শ বিবেচনা করে প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকাসমূহে লেখাপত্র যেভাবে যে সমস্ত মানদণ্ড বিবেচনা করে ছাপা হতো, তা সামাজিক-রাজনৈতিক উপযোগবাদী কিংবা দায়বোধের বিষয় বিবেচনায় আনতে ততটা সমর্থ হয়নি, যতটা সমর্থ হয়েছিল *সমকাল*।

যে কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও ইতিহাস বিনির্মাণের বেলায় সাহিত্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সাহিত্যের আভিধানিক অর্থেও এই ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি মানুষ যে কথা ইতিহাস কিংবা অন্যান্য রাষ্ট্রনৈতিক আলাপে বলতে দ্বিধা ও সাহসের অভাবের ভেতর দিয়ে যায়, সাহিত্যে নির্দ্বিধায় ও সৎ সাহসের ওপর ভর করেই যেন তা করতে পারে। আর এই বিষয় সম্পাদনের জন্য পত্র-পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মানুষের চিন্তা পরিবহণের জন্য যেমন দরকার পড়ে ভাষার কিংবা ভাষার মতো আরো কিছু মাধ্যমের; তেমনি করে ভাষাকে পরিবাহী করে সাহিত্যিকরা যে সাহিত্যচর্চা করেন, তা প্রকাশের জন্য পত্রিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আর ঐতিহাসিক বিবেচনায় প্রতিপালকের ভূমিকায় থাকে পত্র-পত্রিকা।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনাবিন্দুতেও পত্র-পত্রিকাগুলো সাহিত্য ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে বৃহৎ ভূমিকা পালন করেছিল, পূর্বে তা উচ্চারিত হয়েছে। পুরো উনিশ ও বিশ শতকে, অবিভক্ত বাংলায় যে সমস্ত সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক আমরা দেখি, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকে কোনো না কোনোভাবে পত্র-পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত থেকেই তাঁদের অবদান রাষ্ট্র ও জনগণের সাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। এই একই প্রকল্প-পদ্ধতিতে ভারতীয় মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার যে ইতিহাস রয়েছে, তার সমাধানকল্পেও অবদান রয়েছে পত্র-পত্রিকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই সময় আর এর পরিপার্শ্বের বিভিন্ন সজ্জন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শিখা-গোষ্ঠী। শিখা-গোষ্ঠীর এই অবদান অস্বীকার করে বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তিকে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। আমরা বলতে পারি এই দ্বিতীয় ঢেউ-নির্ভর শিখা-গোষ্ঠীর মুখপত্রের পরে একেবারেই বর্ধিত চিন্তা-আদর্শ নিয়ে *সমকালের* যাত্রা শুরু হয়েছিল।

৩.

'আমরা আগেই দেখেছি যে আজ পর্যন্ত সব ধরনের সমাজ গড়ে উঠেছে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণির বিরোধের ভিত্তিতে' (মার্কস ও এঙ্গেলস, ১৯৭০, পৃ. ৪৫)। এমন কথা কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস উচ্চারণ করেছেন উনিশ শতকে, তাঁদের রচিত *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে*। মার্কস ও এঙ্গেলসের এইরূপ চিন্তার পর আরও অনেক রাষ্ট্রচিন্তক রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণা ব্যক্ত করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ফ্রাঞ্জ ওপেনহাইমার রাষ্ট্র প্রসঙ্গে বলেছেন, 'The State may be defined as an organization of one class dominating over the other classes' (Oppenheimer, 1914, p. prefece-iv)। এই ধারণা আর. এম. ম্যাকাইভার তাঁর *আধুনিক রাষ্ট্র* গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু এর বিপরীতে তিনি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রকাঠামোকেই গ্রহণযোগ্য 'আধুনিক রাষ্ট্র' হিসেবে বিবেচনা করেছেন (ম্যাকাইভার, ১৯৭৭, পৃ. ১৪৬)। এমনকি তাঁরও আগে, সতেরো শতকে টমাস মোর– তাঁর সমূহ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বিপরীতে অকল্যাণমূলক রাষ্ট্র বিষয়ের ধারণা উপস্থাপন করেছেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস বর্ণিত রাষ্ট্র সম্পর্কিত সেই ধারণা ইংরেজ উপনিবেশিত পূর্ববাংলায়ও থাকল। এরপর ইংরেজ আমল থেকে স্বাধীন হয়ে নতুন সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রেও দেখা গেল, রাষ্ট্র সম্পর্কিত পুরোনো নিপীড়নমূলক ধারণাই সক্রিয় থাকল। একটি নয়া-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা পুরোপুরি সৃষ্টি না হলেও আধিপত্য-শোষণ-নিপীড়নের ধারাবাহিকতা থেকে পূর্ববাংলা পূর্ব পাকিস্তান আমলেও মুক্ত হতে পারল না। বরঞ্চ যে আকাঙ্ক্ষা আর আবেগ নিয়ে পূর্ববাংলার মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করে পূর্ববাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানে রূপান্তর করেছিল, সেই আকাঙ্ক্ষা এবং আবেগ কোনোভাবে ন্যূনতমও পূরণ হয়নি। এমনকি যে আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় ধর্মের বিবেচনায় এই অঞ্চলের মানুষ দুটি রাষ্ট্র বেছে নিলো, সেই বিবেচনাও এই অঞ্চলের মানুষের জন্য কল্যাণকর হলো না। এমনকি কেবলই নিজেদের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য পাকিস্তান আন্দোলনে পূর্ববাংলার তফসিলভুক্ত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অবধি পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল।

একটি জন-আকাঙ্ক্ষায় পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমনকি পঞ্চাশ-ষাটের দশকে যে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের প্রায় শতভাগ চল্লিশের দশকের পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ এবং দেশভাগের মাধ্যমে পূর্ববাংলাকে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিজগতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কেও সমান মন্তব্য করা যায়। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই ভাষা প্রশ্নে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তব্য সবকিছু আমূল পরিবর্তন করে ফেলেছিল। পাকিস্তানবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী ফররুখ আহমদের মতো কবি ভাষা প্রশ্নে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। এরপর ১৯৫৮ সাল থেকে আইয়ুব খানের

সামরিক শাসন এবং তৎপরবর্তী সময়ে নানা রকম নিপীড়ন-শোষণ-বঞ্চনা ক্রমাগত পাকিস্তান জাতীয়তাবাদী চিন্তা-আদর্শ এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র নৈতিকতার ভিত্তিতে দুর্বল হতে থাকে এবং সর্বশেষ ফলাফল হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ও নতুন দেশ সৃষ্টি– বাংলাদেশ।

মার্ক্সীয় রাষ্ট্রতাত্ত্বিক লুই আলথুসের বর্ণিত রাষ্ট্রের ভাবাদর্শগত হাতিয়ার (Ideological State Apparatuses) রাষ্ট্রের ভেতর বিদ্যমান মানুষ ও মানুষের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মকাণ্ডকে সংকোচন, নিয়ন্ত্রণ ও দমন করতে চায়। 'এখানে তিনি দেখান, কীভাবে, কোন কোন উপায়ে, একটি সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সংখ্যালঘু অল্পকিছু মানুষ আধিপত্য কায়েম করতে পারে এবং তা বজায় রাখতে পারে' (আলথুসের, ২০২২, পৃ. ২৬)। এই প্রক্রিয়াটি বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের ব্যাপারে একটি জটিল প্রক্রিয়া হিসেবেও বিবেচিত হবে, পাকিস্তান আমলেও এই ধারণা পাকিস্তান রাষ্ট্রে সক্রিয় ছিল।

'আইডিওলজি এন্ড আইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস'-এ আলথুসের প্রধানত দুটি ভাগে তিনটি বিষয়ে নতুনতর বিশ্লেষণ হাজির করেন। প্রথম ভাগে তিনি দেখান রাষ্ট্রের উপরিকাঠামোতে দু'ধরনের হাতিয়ার রয়েছে– ভাবাদর্শিক ও দমনমূলক। *ভাবাদর্শিক হাতিয়ার*সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শিক্ষা সংস্থাগুলো– যেমন, সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, পরিবারব্যবস্থা, আইনগত ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষভাবে ধর্মীয় সংস্থাগুলো। অন্যদিকে, রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনরা সহিংসতার উপর ভর করে আরও কিছু হাতিয়ার ব্যবহার করে। যেমন: পুলিশ, সেনাবাহিনী, কারাগার ইত্যাদি। এগুলোকে তিনি বলেছেন *দমনমূলক হাতিয়ার* (আলথুসের, ২০২২, পৃপৃ. ২৭–২৮)।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্র-কাঠামো কিংবা ক্ষমতাতন্ত্র পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ওপর আলথুসের বর্ণিত এই দুই ধরনের কর্মকাণ্ডই চালাতে থাকে। এর পদ্ধতি হিসেবে ছিল পাকিস্তানের ধর্মীয় জাতীয়তায় নির্মিত পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ, সামন্ত ও স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা, এবং সবশেষ সামরিক একনায়কতন্ত্রের মাধ্যমে অখণ্ড শিলায় রূপান্তরিত একটি অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই তিনটি প্রক্রিয়া ঠিকঠাক রাখার জন্য জনসাধারণের ওপর ভাবাদর্শিক হাতিয়ারের সাথে সাথে দমনমূলক হাতিয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মম দমন-পীড়নও চালু রাখা হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রে। সাধারণ মানুষের জীবন এই প্রক্রিয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে কোনো অঞ্চলে সাধারণ জনগণের মানস-জগতে একটি বিষয় রয়েই যায়, তা হলো উপরিউক্ত ক্রিয়া-কর্মের বিরুদ্ধে একটি পর্যায়ে লাগাতার আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের কর্মকাণ্ড। কিন্তু এর সাথে যে একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের জনগণ থাকবে বিষয়টি এমন নয়। উনিশ শতকের ফ্রান্সের 'ফরাসি

লেজিটিমিস্টদের' মতো পাকিস্তান শাসনামলেও এই ধারণাকে পোক্ত করার জন্য 'পাকিস্তানী লেজিটিমিস্টদের' কর্মতৎপরতা চোখে পড়ার মতো।

৪.

ঢাকাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-ধারণার যাত্রা শুরু হয়েছিল ষাটের দশকে– উক্তিটি যৌক্তিকতার বিচারে পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ এই আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের দশক থেকেই, ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার পরপরই। এই ঘটনা এই অঞ্চলের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলই কেবল প্রভাবিত করল না, শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক জগৎকেও প্রভাবিত করেছিল বৃহৎভাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ভাষা আন্দোলন ক্রমান্বয়ে সমগ্র জাতিকে একসুরে বাঁধতে পেরেছিল। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে এই আন্দোলনের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। বলা যায় যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পাটাতন হিসেবেও এই আন্দোলন সবিশেষ ছিল।

ভাষা আন্দোলন এই অঞ্চলের শিল্প-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্বাসকে আমূল পরিবর্তন করে তুলেছিল। চল্লিশের দশকে যে সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিক তাঁদের শিল্প ও সাহিত্যের জন্য 'আধুনিকতাবাদী' নন্দনতত্ত্বকে পরিগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা এই আন্দোলনের ভেতর দিয়ে নতুন রাজনৈতিক সাহিত্য-নন্দনতত্ত্বে সওয়ার হয়েছিলেন। 'শিল্পের জন্য শিল্প'– এই ধারণাই পুরোপুরি বদলে গিয়েছিল। সানাউল হক, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল গণি হাজারী, সিকান্‌দার আবু জাফর, সৈয়দ আলী আহসান, শামসুর রাহমান প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক 'আধুনিকতাবাদী' সাহিত্য-নন্দনতত্ত্বে বিশ্বাস ও আস্থা আনার পরও এই আন্দোলনের পরপরই তাঁদের সাহিত্যচিন্তাকে বিমূর্ত ভাবধারা থেকে নতুন আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় মূর্ত ভাবধারায় নতুন করে নির্মাণ করে নিয়েছিলেন; যা বাংলাদেশের সামগ্রিক শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির গূঢ়ার্থ বিবেচনায়ও সমর্থনযোগ্য। *সমকাল* পত্রিকা এই জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডের অন্যতম পাটাতন হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাসসহ বিবিধ বিষয়ে লেখা ছাপিয়ে সিকান্‌দার আবু জাফর ছিলেন এই কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান সারথি। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 'সমকাল কলা-পরিষদ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনও গড়ে উঠেছিল।

৪.১.

'সংস্কৃতি' এই শব্দটি নানার্থে জটিল বিষয় হিসেবেই শেষমেশ উপস্থাপিত হয়। আলোচনাকালে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতে থাকে এই বিষয়ে। পুব-পশ্চিমের বিবেচনায়ও শব্দটি

আরও জটিল আকার ধারণ করে। রেইমন্ড উইলিয়ামসও (Raymond Wiliams) সংস্কৃতির এই জটিল প্রসঙ্গে বলেছেন, 'Culture is one of the two or three most complicated words in the English language' (Raymond, 1985, p. 87)। এক জাতির বিবেচনায় সংস্কৃতি যেভাবে আমাদের মাঝে মূর্ত কিংবা বিমূর্ত বিষয় হিসেবে ধরা দেয়, বহুজাতিক কিংবা জাতিতাত্ত্বিকভাবে সংমিশ্রিত জাতিরাষ্ট্রের ভেতরে সংস্কৃতি বেশ জটিল রূপেই বিদ্যমান থাকে।

তারপরও বলা যায় যে, সংস্কৃতি এমন একটি বিষয়, যা একটি সমাজ বা জাতির দীর্ঘদিনের নানা কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে অর্জিত ও অভ্যাসগত জীবনাধারার সমন্বিত রূপ। সংস্কৃতি প্রশ্নটি নানারূপ সংশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন ধারারূপে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে সক্রিয় রয়েছে। আধুনিক যুগ-পূর্বে পূর্ববাংলা, পূর্ব পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশ রাষ্ট্রে সংস্কৃতি প্রশ্ন নিয়ে বরাবরই নানা রকম বিতর্কমূলক প্রশ্ন উত্থাপনের বিষয় দৃশ্যগোচর হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে এবং রাজনৈতিক পরিসরে সংস্কৃতি প্রসঙ্গে যে বির্তক সেই পাকিস্তান আমল থেকে আজ অবধি চলছে– যা বেশ জটিল পর্যায়ে এসেই পৌঁছেছে বর্তমানে। যদিও টি. এস. এলিয়ট সংস্কৃতিকে রাজনৈতিক পরিসরের বিবেচনায় সম্পৃক্ত করাকে সংস্কৃতির জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সংস্কৃতিকে অনুভূতির সারবস্তু না ভেবে বরঞ্চ জনগণের ভেতরের অনুভূতি হিসেবে সংস্কৃতিকে বিবেচনা করেছেন (Eliot, 1949, p. 94)। এবং সংস্কৃতি বিষয়কে বারবার তিনি একটি চলিষ্ণু সত্তা হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিবেচনায় এলিয়টের এই ধারণা বিশেষভাবে সক্রিয় থাকে না। বরঞ্চ এলিয়টের বিপরীতেই যেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংস্কৃতি ধারণাটি সক্রিয় থাকে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অবস্থান ছিল এক রকম এবং ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হওয়ার পরপরই কেবল বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভূগোলে বিদ্যমান সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়েছিল এমন নয়, প্রচলিত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাই ভেঙে পড়েছিল। ইংল্যান্ড ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামো ভেঙে ফেলেছিল এবং এটিকে তার সমস্ত প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে আলাদা করেছিল। মার্ক্স প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের ছয়টি সামাজিক ধরনও চিহ্নিত করেছেন (Marx, 1853)। কিন্তু মার্কস চিহ্নিত ভারতের সাংস্কৃতিক অবস্থা উপনিবেশিত ভারত কিংবা বাংলায় পুরোপুরি বিদ্যমান থাকতে পারেনি উপরিকাঠামোতে। আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেনি।

সংস্কৃতি মূলত বিভাজনগতভাবে দুই রকম– বস্তুগত আর অবস্তুগত। *সমকাল* পত্রিকায় সিকান্দার আবু জাফর বাঙালির অবস্তুগত (Non-Material) সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নিয়ে এসেছেন। তাঁর সম্পাদিত *সমকাল* পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলোতে বাঙালি সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আদিম সংস্কৃতি, গোষ্ঠী সংস্কৃতি এবং তৎপরবর্তী সময়ে

নগরীয় সংস্কৃতির একটি সমন্বয়বাদী ধারণাও প্রকাশিত হয়েছে। রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়াদি ব্যতীত সংস্কৃতির নিজস্ব সত্তা বিষয়ক ধারণাও স্পষ্ট করতে চেয়েছেন প্রাবন্ধিকরা।

রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ কিংবা শাসনচক্র পরিবর্তিত হলে রাষ্ট্রের বিচিত্র বিষয় পরিবর্তিত হলেও সংস্কৃতি পরিবর্তনের বিষয়টি এককভাবে কিংবা সরলতায় সম্পাদন সম্ভব নয়। বরঞ্চ এই প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতি ক্রমান্বয়ে নিবর্তনমূলক পরিস্থিতিতে সম্পাদিত হয়। এই বিষয়টি একটি রাষ্ট্রের একটি বিমূর্ত ধারণার বিপরীতে নিপীড়নের নতুন কলকব্জা হিসেবেই ধারণায়িত হবে। 'Every ruling class creates its own culture, and consequently, its own art' (Trotsky, 1924, Chapter-6)। জাতীয়তাবাদী বিশেষভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তার উদ্ভব বিকাশ ও পরিণতির যে ইতিহাস, সেই ইতিহাস কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়। কারণ একটি অঞ্চলের সমগ্র জনগোষ্ঠীর সমর্থন ব্যতীত একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কখনই সফল হতে পারে না। এক্ষেত্রে একথাও সত্য যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শতভাগ জনগণগণের সমর্থনের ব্যাপারটি স্পষ্টাকারে থাকে। কিন্তু বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরে পূর্ববাংলায় যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হয়েছিল তাতে দেখা যাচ্ছে যে, বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ক্রমশই এই অঞ্চলের মানুষকে একত্র করতে পেরেছিল; এবং সংস্কৃতি প্রসঙ্গ অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল।

সমকাল পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই পূর্ববাংলার সংস্কৃতি, আরও বিস্তৃত অর্থে 'জাতীয় সংস্কৃতি' প্রসঙ্গে বিচিত্র চিন্তা-আদর্শের লেখকরা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় বাংলাদেশের প্রধানতম সমাজবিজ্ঞানী এ. কে. নাজমুল করিম লিখেছিলেন 'ভাষা ও কালচার' শিরোনামের প্রবন্ধ। এই একই সংখ্যায় কাজী দীন মুহম্মদ লিখেছিলেন 'পূর্ব বাংলা সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় দ্বিজেন শর্মা লিখেছিলেন 'পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে' শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রথম বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যায় এ. কে. নাজমুল করিম লিখেছিলেন 'বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রথম বর্ষ, সপ্তম-অষ্টম সংখ্যায় মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ। সিকান্‌দার আবু জাফরের *সমকাল* সম্পাদনাকালের সম্পূর্ণ সময় বিবেচনা নয়, সংস্কৃতি প্রসঙ্গে প্রথম বর্ষে *সমকাল* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ বিবেচনা করলেই এই বিষয় স্পষ্ট হয় যে, পূর্ববাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে তিনি বেশ সতর্কই ছিলেন। এই বিষয়ে একটি উদাহরণ:

> সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অন্যবিধ নিদান-নির্ণয় আমার লক্ষ্য নয়, যে-কারণেই উদ্ভূত হোক, নৈতিকতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে এর মূল্যায়নই আমার লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িকতাকে ষোলো আনা আমি খারাপ বলছি না; সাম্প্রদায়িক অনুভূতি সেই পর্যন্ত সমর্থনীয়, যে-পর্যন্ত তা ভালো অর্থে সমাজ-শৃঙ্খলা

> রক্ষার ও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য বিকাশের অনুকূল, যে পর্যন্ত স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রীতির পরিপোষক এবং স্ব-সম্প্রদায়ের মঙ্গল-চিন্তায় অনুপ্রাণিত (আবদুল হক, ১৯৭৩, পৃ. ৬৭)।

৪.২.

ভাষা-প্রশ্ন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে যতটা নিম্নবর্গের সাথে বিবেচ্য তার চেয়ে বেশি তা মধ্যবিত্তের সাথে। এমনকি জাতীয়তাবাদের মতো একটি জটিল ধারণাকে গাঠনিক রূপকল্পে জারি রাখার মতো বিষয় সম্পাদনেও মধ্যবিত্ত বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সফল না হলে, এবং এই বিষয় তৎকালীন শাসকশ্রেণি যদি আইনি প্রক্রিয়ায় বৈধতা দিয়ে ফেলতে পারত, তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতো তৎকালীন পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণি। কর্মের ভিত্তি হিসেবে ভাষার বিষয় নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রক্রিয়ায়। এই বিষয়টির সত্যতা ফররুখ আহমদের মতো পাকিস্তানবাদী লেখকের ধারণায়ও পাওয়া সম্ভব। ফররুখ আহ্‌মদ শেষাবধি পাকিস্তানপন্থি হিসেবেই থেকেছেন। কিন্তু ভাষা প্রসঙ্গে তাঁর অবস্থান ছিল বাংলা ভাষার পক্ষে। কারণ বাংলা সাহিত্য আর ভাষা না থাকলে ফররুখ আহ্‌মদের নিজের অস্তিত্বও থাকে না। ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নির্মাণের বেলায় ভাষা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

সমকালের প্রথম সংখ্যা থেকে শেষ পর্যন্ত ভাষা প্রশ্ন নিয়ে নানা রকম প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো সম্পাদক কি এমনি এমনি এই কাজ করেছিলেন? উত্তর হবে, না। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাথে ভাষা সম্পর্কিত বিষয়টি আমলে নিয়েছিলেন এবং তা তাঁর *সমকাল* পত্রিকায় স্থান দিয়েছিলেন। প্রথম বর্ষ, সপ্তম-অষ্টম সংখ্যায় ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল: শিরোনাম: 'তোষামোদের ভাষা', প্রাবন্ধিক ছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই। প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যায় মুহম্মদ আবদুল হাই ভাষা নিয়ে আবার প্রবন্ধ লিখেছিলেন, শিরোনাম: 'রাজনীতির ভাষা'। দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় এ. কে. নাজমুল করিম লিখেছিলেন 'ভাষা ও বাঙালী মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধ। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা নিয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই লিখেছিলেন 'রোমান বনাম বাংলা হরফ'। এরূপ ভাষা সম্পর্কিত প্রতিটি প্রবন্ধ তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক ভাবাদর্শিক চিন্তা-আদর্শের বিপরীতে প্রতিরোধ-প্রকল্প হিসেবে সক্রিয় থেকেছে।

৪.৩.

সাহিত্য প্রশ্নে সাহিত্যের নান্দনিক ভিত্তি ও এর ওপর ভিত্তি করে পর্যালোচনার যে পদক্ষেপ, তার সাথে কল্পনাপ্রবণতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কল্পনাপ্রবণতা বাংলা সাহিত্যে নেই, তা বলা সম্ভব নয়; কিন্তু কল্পনাপ্রবণতার বাইরে বহির্জাগতিক বাস্তবতাকে ধারণ করে কল্পনার সংমিশ্রিত রূপের সাহিত্যিক উপস্থাপনের ধারণা বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। কিন্তু ষাটের

দশকে কেবল নান্দনিক সাহিত্যের বিষয় রাষ্ট্রের জন্য কাজে লাগেনি। *সমকাল* পত্রিকায় রাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী পরিস্থিতির বিপরীতে সাহিত্য কীভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে সে সম্পর্কে ক্রমাগত প্রবন্ধ যেমন ছাপা হয়েছে, তেমনি যে সমস্ত সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত হয়েছে তাও রাষ্ট্রের আধিপত্যমূলক আচরণের বিরোধিতা করেছে। উদাহরণ:

> তেমন মানুষ নাকি আছে/এখানে মাটির ঘরে, বন্দরের শহরের কাছে/ঘরে পরে ফিরি করে পিপাসার জল/শিয়রে অভয় দেয়, শিকড়ে জোগায় বল,/ফুল দেয়, ফল দেয় আর মিঠে হাওয়া/যতো দিতে পারা যায়, যতো যায় দেওয়া/সব দিয়ে, সব শেষে বুক চিরে-চিরে/হৃদয় বিলায়ে দেয় চেনা আর অচেনার ভিড়ে (সানাউল, ১৯৯৮, পৃপৃ. ৪৬–৪৭)।

উপরিউক্ত কবিতাংশ সানাউল হকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *নদী ও মানুষের কবিতা* শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। বাংলাদেশ কেবল নদীমাতৃক দেশ নয়, এই দেশের কৃষি ও কৃষি-সংস্কৃতির বিকাশেও নদীর ভূমিকা অপরিসীম। এখানে উদ্ধৃত কবিতাংশে নদী ও এই অঞ্চলের মানুষের যাপিত জীবনের সমন্বয় প্রদর্শিত হয়েছে; যা স্বাতন্ত্র্যবাদী জাতীয় আন্দোলনের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক শক্তি হয়। এই রকম একটি কাব্যের সমালোচনা *সমকালের* প্রথম সংখ্যায় লেখেন আবদুল গণি হাজারী, যা *সমকালের* সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্যও জরুরি।

‘তিতাস’ শিরোনামের আল মাহমুদের কবিতাটি *সমকালের* প্রথম বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা ১৩৬৪-এ প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতার কিছু অংশ উদাহরণ হিসেবে নিচে উপস্থাপন করা হলো:

> শহরের/শেষ প্রান্তে যেখানে আমার ঘর, নরম বিছানা,/সেখানে রেখেছি দেহ। অবসাদে ঘুম নেমে এলে/আবার দেখেছি ঝিকিমিকি সেই শবরী তিতাস/কী গভীর জলধারা ছড়ালো সে হৃদয়ে আমার।/ সোনার বৈঠার ঘায়ে পবনের নাও যেন আমি/ বেয়ে নিয়ে চলি একা অলৌকিক যৌবনের দেশে (মাহমুদ, ১৯৮০, পৃ. ২২)।

‘হাতির শুঁড়’ শিরোনামের শামসুর রাহমানের কবিতাটি *সমকালের* দ্বিতীয় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা ১৩৬৬-এ প্রকাশিত হয়েছিল। ‘মেষতন্ত্র’ শামসুর রাহমানের প্রথম লেখা কোনো রাজনৈতিক কবিতা। আর দ্বিতীয় কবিতা ‘হাতির শুঁড়’। কবি কবিতায় বলছেন নিম্নোক্তভাবে:

> ঐরাবতের খেয়ালখুশির ধন্দায়/ভোরের ফকির মুকুট পরে সন্ধ্যায়।/প্রাক্তন সেই ভেল্কিবাজির মন্তরে/যাচ্ছে চেনা অনেক সাধু-সন্তরে (শামসুর, ২০১৭, পৃ. ৭৮)।

আবু ইসহাকের 'জোঁক' শিরোনামের গল্পটি *সমকালের* প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা-১৩৬৫-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্প পূর্ববাংলায় সামন্তব্যবস্থায় সাধারণ কৃষকদের যে জীবন-অবস্থা, তার করুণ চিত্রের প্রতিফলন হিসেবেই বিবেচিত হয় আজাবধি। সাহিত্যের সাথে সাথে শিল্প ধারণাও এই পত্রিকার প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। পূর্ববাংলার শিল্প কেমন হবে?– এই প্রশ্ন এই অঞ্চলের শিল্পীদের বিবর্তমান শিল্পযাত্রার দিকে নজর দিলেই স্পষ্ট হয়। এমন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে প্রথম সংখ্যায় কামরুল হাসানের 'পূর্ব বাংলার শিল্পসৃষ্টির ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধে। এই অঞ্চলের মানুষের জীবন-জগৎ-সমাজ এবং এই তিন ধারণার সমন্বয়েই পূর্ববাংলার শিল্প ব্যাপারটি স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত হয়েছিল। সাহিত্য প্রসঙ্গেও এই কথাটিই খাটে।

৪.৪.

সমকাল পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর– বিষয়কে কেন সিকান্‌দার আবু জাফর গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন? কেন তিনি তাঁর সম্পাদিত *সমকাল* পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক প্রবন্ধ ছাপতে লাগলেন? প্রধান উত্তর হিসেবে আসে যে, ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তায় এটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল; জাতীয় আন্দোলনে সাংস্কৃতিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি হিসেবে এই অঞ্চলের মানুষের জন্য কাজ করেছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাসমূহ। এই বিষয় স্পষ্ট যে, আধুনিক রাষ্ট্রের যে সমস্ত সমস্যা ছিল তার প্রায় প্রত্যেকটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভেবেছেন, লিখেছেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা সক্রিয় ছিল, সেই রাষ্ট্রের ভাবাদর্শিক হাতিয়ারের বিপরীতে যদি রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তাকে দাঁড় করানো যায়, তো এই বিষয় আরও স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথ কেবল সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের আলোকবর্তিকা বহনকারী হিসেবে সিকান্‌দার আবু জাফরের কাছে আসেননি, ঐ সময়ের বিবেচনায় তিনি এমনটা ভাবার ফুরসতও পাননি বোধহয়। বরঞ্চ কাব্যের বিবেচনায় রোমান্টিক কিংবা আধা-মাপের ভিক্টোরীয় নীতিবোধের প্রচারক রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র ও পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর লেখায় যে বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেছেন, তা পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র ধারণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ধারণা হিসেবেই বিবেচিত হবে।

আরও অর্থে পূর্ববঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের একটি বড়ো অংশ জুড়েই রয়েছে। এই বিষয় সিকান্‌দার আবু জাফরের চেতনাজগতে সক্রিয় থেকেছে এবং এই যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভেতরে নিপীড়নমূলক হাতিয়ার, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সক্রিয় বিরোধিতার মতো নির্মাণের বেলায় সিকান্‌দার আবু জাফর *সমকাল* পত্রিকা ব্যবহার করেছেন। প্রবল রবীন্দ্র-বিরোধিতার কালে সিকান্‌দার আবু জাফর রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীতে *সমকালের* রবীন্দ্র-সংখ্যা করেছেন। ধারাবাহিকভাবেও *সমকাল* পত্রিকায় রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রের বিপরীতে লড়াইয়ের প্রকল্প হিসেবে। এই

বিষয়ে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অন্যতম সংগঠক খান সারওয়ার মুরশিদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করার অনেকগুলো কারণ ছিলো। প্রধান কারণ ছিল সাংস্কৃতিক এবং এ কারণে রাজনৈতিক।... রবীন্দ্রনাথের বর্ণাঢ্য বিচিত্রমুখী অবদান বাঙালি সত্তাকে ঋদ্ধ করেছে। পাকিস্তানী হয়েও আমরা তাঁর অংশীদার। সুতরাং সে মহৎ সাহিত্য আমার, এবং আমার উত্তরাধিকারীকে আমি তা থেকে বঞ্চিত হতে দেবো কেন? নিষেধ কেন? অন্যায় নিষেধ, বিশেষ করে স্বৈরশাসকের নিয়ন্ত্রণ সহ্য করা, অমার্জিত কল্পনাহীন অহঙ্কারের হুকুম তালিম করা আমার পক্ষে অসহনীয় ছিল (মুরশিদ, ২০১৭, পৃপৃ. ১০৭–১০৯)।

এই একটি সংখ্যা করেই তিনি থেমে যাননি। তিনি *সমকাল* পত্রিকা প্রকাশের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে সেই সময়ের বিখ্যাত প্রাবন্ধিক এবং চিন্তকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়েছেন, যা দুই বাংলায় রবীন্দ্র-চর্চার ক্ষেত্রে মাইলফলক হয়ে থাকবে। এই বিষয়টি তিনি উদারনৈতিক মানবতাবাদী চিন্তকদের সাথে নিয়ে যেমন করেছেন, তেমনি করে পাকিস্তান জাতীয়তাবাদে পূর্ণ আস্থাবান ব্যক্তিদের দিয়েও করে নিয়েছেন। যেমন: সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনকে দিয়ে তিনি রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীতে প্রবন্ধ লিখিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে *সমকাল* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এমন কয়েকটি লেখার চুম্বকাংশ নিচে উপস্থাপিত হলো:

ক. আমি মনে করি, ইকবাল প্রধানত গতির কবি, রবীন্দ্রনাথ যথার্থত স্থিতির কবি এবং হাফিজ বস্তুর সুপ্তির কবি (শহীদুল্লাহ্, ২০১৯, পৃ. ৩১)।

খ. এ কথা সত্য যে, তৎকালীন ভারতবর্ষের (১৯০০–১৯৪৭ পর্যন্ত) একটা প্রধান, বোধহয় সর্বপ্রধান, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ছিল হিন্দু-মুসলিম সমস্যা। রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মন এ বিষয়ে স্বভাবতই উদাসীন থাকতে পারেনি (মোফাজ্জল, ২০১৯, পৃপৃ. ৫৫–৫৬)।

গ. রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি, ধর্ম, দর্শনের সবটা আমাদের গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করি তিনি রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ যাঁর সাধনায় বাংলা সাহিত্য শুধু সমৃদ্ধ নয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত হয়েছে (সাজ্জাদ, ২০১৯, পৃ. ১০৯)।

ঘ. হে নব প্রাচ্যের রবি– হে কবীন্দ্র আজ নাই তুমি;/দীর্ঘ এক শতাব্দীর ছায়াময় প্রান্ত দেশে আসি/তবু নব মেঘভার আসে বহ্নি' দক্ষিণা মৌসুমী/মৃত্যু-হীন দ্যুতি তব তারি বক্ষ-বিদ্যুতে উদ্ভাসি (বে-নজীর, ২০১৯, পৃ. ১৭৫)।

৪.৫

পাকিস্তান রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্রের ধর্ম এবং রাষ্ট্র ও ধর্ম প্রসঙ্গ নিয়ে *সমকাল* পত্রিকায় বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের লেখা ছাপা হয়েছে ক্রমাগত। ধর্ম রাষ্ট্র সংস্কৃতি প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা ছাপানোর জন্য *সমকাল* পত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞাও জারি হয়েছিল। আইয়ুব খানের শাসনামলে কয়েকবার *সমকাল* পত্রিকা শাসকের নিষেধাজ্ঞায় পড়েছিল। এই পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন তাঁরাও গোয়েন্দা নজরদারিতে পড়েছিলেন। আবদুল হকের দুটি প্রবন্ধ এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আবদুল হক নিজেই এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন নিম্নরূপ:

> এ-সংকলনের সবগুলি প্রবন্ধই বেরিয়েছিল ‘সমকাল’-এ, ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে। লেখক হিসাবে নাম ছাপা হয়েছিল “আবু আহসান”। আনকোরা নতুন নাম, তবু দুটি প্রবন্ধ কতিপয় অপ্রত্যাশিত মহলে ঐ পত্রিকার পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। মহলগুলি হচ্ছে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের হোম ডিপার্টমেন্ট, ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগ। প্রবন্ধ দুটির শিরোনাম “যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িকতা” এবং “মুসলিম জাতীয়তাবাদ : পুনর্নিরীক্ষা”। বিশেষ করে দ্বিতীয়োক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের জন্য সমকাল মুদ্রায়ণ এবং ‘সমকাল’ পত্রিকা বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। সম্পাদক সিকান্‌দার আবু জাফর সাহেবকে হোম ডিপার্টমেণ্ট অনেক হয়রান করেছিল। সে ইতিহাস কখনো তিনি হয়ত নিজেই লিখবেন; মজলিসী আলাপে অনেককে বলেছেন। আমি নিজে যতদূর জানি তা এখানে বলা সঙ্গত বিবেচনা করি, কেননা অন্ধকার-যুগের যেইসব কথা আমাদের সংস্কৃতি-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (আবদুল হক, ১৯৭৩, ‘এই বেনামী প্রবন্ধমালা’ শীর্ষক ভূমিকাংশ থেকে)।

এছাড়া বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, ‘মুসলিম জাতীয়তাবাদ: পুনর্নিরীক্ষা’ প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল ১৯৬৬ সালে। এর লক্ষ্য ছিল শুধু জিন্নাহ্ সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্বের ভ্রান্তি নির্দেশ করা নয়; ঐ দ্বিজাতিতত্ত্বেরই যুক্তির উপর বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত করা।

এই দুটি প্রবন্ধে ধর্ম প্রসঙ্গে *সমকাল* পত্রিকা থেকেছে উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী চিন্তার সমন্বয়ের ভেতরে। ধর্মীয় গোঁড়ামির বিষয় প্রায় প্রত্যেক লেখকই খারিজ করতে চেয়েছেন। ত্রিশ-চল্লিশের দশকে যে ধারণার ভেতর দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈধতা তৈরি হয়ে নতুন রাষ্ট্র নির্মাণ হয়েছিল, আধুনিক রাষ্ট্রের বিবেচনায় যেখানে ভৌগোলিক কোনো ধারণাকেই বিবেচনা না করে, সেই ধারণাকে ক্রমান্বয়ে বিপরীত চিন্তা দ্বারা প্রতিরোধ করার বিষয় ছিল *সমকাল* পত্রিকার। এই প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মের বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলোতে খোদ খ্রিষ্টধর্মের ভেতরেই নতুন নতুন বর্গের বা জাতের ধর্মীয় সমস্যা আর জাতি-রাষ্ট্র বিষয়টি নির্মাণ বিনির্মাণের প্রক্রিয়ায় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এত বেশি ধর্মীয়

বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় যে, সেখানে কোনো একক ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তা নির্মাণ একার্থে অসম্ভব হয়। এই কারণে এই অঞ্চলে জাতীয়তা আর ধর্ম-পরিচয় প্রসঙ্গ বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে।

কিন্তু এর একটা ভালো সমাধান হলো সাদৃশ্যমানতা তৈরি করা। এই সাদৃশ্যমানতা নানা কারণে বেশ ভালো বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পূর্ববঙ্গে কেবল নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই ধর্ম ব্যাপারটি শাসক আর ঐতিহাসিক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে এই অঞ্চলের বাইরে থেকে এসেছে। ফলে পৃথিবীর অন্য অঞ্চলে ধর্মের উদ্ভব-বিকাশ নির্দিষ্ট ভূমিকে আঁকড়েই ঘটেছে। ফলে ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বেশ ভালো মাপের সমন্বয় সম্ভব হয়েছে। এই একই ধারণার বিপরীত পাঠে এই অঞ্চলে অন্য অঞ্চল থেকে যখন বিভিন্ন ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে, তখন একটি সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত সংকট দাঁড়িয়ে গিয়েছিল; যা আজ অবধি সংস্কৃতি আর ধর্মের বিবেচনায় সক্রিয় হিসেবেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক গোলার্ধে সক্রিয় থেকেছে। নৈরাজ্যমূলক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, হচ্ছে, এবং হবেও কি?

সমকালে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহে এই পরিস্থিতির একটি সমাধনকল্প দাঁড় করানোর চেষ্টা সিকান্‌দার আবু জাফর ক্রমাগত করে গেছেন। ধর্মীয় বহুত্ববাদী ধারণার প্রচার এবং এর অগ্রভাগে মানবিকতা কিংবা আরও বৃহৎ অর্থে মানবতাবাদী চিন্তাও প্রকাশিত হয়েছে। বহুধর্মের অন্তর্ভুক্তিমুলক ভূমি নির্মাণের জন্য চিন্তা বিষয়ক আলাপটি অনেকেই তুলেছেন। ১৯৫৭ সনে প্রথম বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যায় এই ধারা ও ধারণার দুটি লেখা ছাপা হয়েছিল: ক. 'বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতি'; খ. 'পাকিস্তানী আদর্শ'। ১৯৫৮ সনে প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল একটি লেখা, শিরোনাম: 'পাকিস্তানে ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা'। প্রথম দিককার লেখাগুলোতে উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী ধারণাকে রক্ষা করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সমন্বয় আর সমুন্নতির ব্যাপারে এই সমস্ত লেখকের কোনো পার্থক্য চোখে পড়েনি। অর্থাৎ ধর্ম বিবেচনায় অন্তর্ভুক্তিমূলকতা আর রাষ্ট্রের কল্যাণকামী বৈশিষ্ট্যই সেই সময়ের সমকালের ধর্ম বিষয়ক লেখাগুলোর মূল ভাব।

কিন্তু ১৯৫৯ সালে দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যায় ছাপা হয় 'ইকবালের ধর্মতত্ত্ব' নামে অনূদিত প্রবন্ধ। আমরা জানি যে, ইকবালের ইসলাম মূলত 'পুনর্নির্মাণবাদী ইসলাম', যা আধুনিক দার্শনিক ভাবধারাসঞ্জাত। কিংবা এরপরে প্রকাশিত আরও গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের প্রবন্ধে এই সমন্বয়বাদী ইসলাম ধারণাই বারবার ব্যক্ত হয়েছে, পাকিস্তানবাদী কট্টর রাজনৈতিক ধর্ম-ধারণার বিপরীতে। এবনে গোলাম সামাদের মতো চিন্তকরা পর্যন্ত ধর্ম, রাষ্ট্র ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ আলোচনা করে রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের অসারতা প্রমাণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> এবনে গোলাম সামাদও 'ধর্ম, রাষ্ট্র, জীবন' শীর্ষক প্রবন্ধে (*সমকাল*, ৭ বর্ষ, ১ সংখ্যায় প্রকাশিত) ধর্ম, রাষ্ট্র ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ আলোচনা করে রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের অসারতা প্রমাণ করেছেন (রবিউল, ২০১৫, পৃ. ৯৯)।

শেষাবধি এই চিন্তা-আদর্শগত ধারণায় পাকিস্তান জাতীয়তাবাদী ধারণা গ্রাস করেছে নতুন সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণার মাধ্যমে। রাষ্ট্র, ধর্ম, লৌকিকতা ও অলৌকিকতা, সেক্যুউলারিজম-সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি সম্পর্কে সমকালের ৭ম বর্ষ, পঞ্চম-সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল আবুল ফজলের 'মানবতন্ত্র' প্রবন্ধটি। আবুল ফজল বলছেন নিম্নরূপ:

> ইসলামের অর্থ শান্তি। ধর্মকে এর স্ববিরোধিতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে মানুষের দৃষ্টি ধর্মের দিক থেকে মনুষত্ব্যের দিকে ফিরাতে হবে। কোন রকম ধর্মতন্ত্র নয়, মানবতন্ত্রকেই করতে হবে আজ সব দেশের ও সব রাষ্ট্রের আদর্শ। ব্যক্তি বা সমাজ জীবনেও এর থেকে বড় আদর্শ আমার মনের দিগন্তে আমি খুঁজে পাই না (আবুল ফজল, ২০১৬, পৃ. ১৮)।

৫.

সমকাল পত্রিকায় সিকান্‌দার আবু জাফর নতুন ও পুরোনো লেখকদের একটি সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন। এটি চিন্তা-চর্চার জন্যও জরুরি। কারণ যে কোনো চিন্তা-ধারণা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য জরুরি কাজটি করেন লেখকরা। সিকান্‌দার আবু জাফর এই কাজটি বেশ সাফল্যের সাথেই করতে পেরেছিলেন। কারণ *সমকাল* পত্রিকায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যেমন প্রবন্ধ লিখতেন, তেমনি সেই সময়ের তরুণ কবি-প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দও প্রবন্ধ-কবিতা লিখতেন। রাষ্ট্রের সমুন্নতির জন্য, চিন্তা-আদর্শগত ঐক্যের জন্য বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই ঐক্য নির্মাণ বরাবরই বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সিকান্‌দার আবু জাফর তা সাফল্যের সাথেই সম্পাদন করেছেন।

উপরিউক্ত প্রপঞ্চসমূহই প্রধানত যে কোনো রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী ধারণাকে স্পষ্ট ও শক্তিশালী করে, প্রকাশ ও প্রচারে ভূমিকা পালন করে এবং সার্থকতার প্রশ্নও এই সকল প্রপঞ্চের ভেতরেই প্রোথিত থাকে। এই ধারণাসমূহ নিয়েই জাতীয়তাবাদী তাত্ত্বিক চিন্তায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণা পঞ্চাশ-ষাটের দশকে ছিল অতীব জরুরি। পূর্ববাংলার মানুষের মৌলিক অধিকারসহ নানা রকম অধিকার বিবেচনায় এই আন্দোলন কোনো একক রাজনৈতিক দলের আন্দোলন হিসেবে আর থাকেনি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ববাংলার সেই সময়ের সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। জাতিরাষ্ট্র থেকে জাতীয়তাবাদ নির্মাণের পথটি বিতর্কমূলক। খোদ পশ্চিমেই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার অভাব নেই। কোনো

প্রপঞ্চই শতভাগ সত্য নয়। এই ধারণাও তাই। কিন্তু জাতিরাষ্ট্র থেকে জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে পশ্চিমের সাথে পুর্বের বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। কারণ হলো এই যে, পশ্চিমে যখন জাতিরাষ্ট্র কিংবা আধুনিক রাষ্ট্র ধারণা তৈরি হয়ে গেছে, সেই সময়ে পুবে, ভারতে, আরও ছোটো করে বললে পূর্ববাংলায় তার টিকির নাগালও চোখে পড়ে না। জাতীয়তাবাদী ধারণা নির্মিত হয়েছে এখানে একটি মেকি ধারণাকে কেন্দ্র করে। পশ্চিমের ধারণারই বিশেষ রূপ হিসেবে আবর্তিত হয়েছে এই অঞ্চলে। তারপরও এখানে জাতীয়তাবাদের কল্যাণকামী ও ইতিবাচক ধারণাটির উদ্ভব মূলত হয়েছিল পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে, একান্তই জনগণের আকাঙ্ক্ষায়।

এরপরও জাতীয়তাবাদের ভালো-মন্দের প্রসঙ্গ রয়েই যায়। তারপরও সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি প্রয়োজন বিশ শতকের গণ আন্দোলনের বিবেচনায় যে দরকারি ছিল, তার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। সাধারণ মানুষের নানারূপ অধিকারের বাস্তবায়নের জন্য তা ছিল অতীব জরুরি। কিন্তু বিভাজনের রেখা এই প্রক্রিয়ার ভেতরেও সমাসীন ছিল। ফলে ত্রিশ-চল্লিশের দশকেই ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী ধারণা বিভক্ত হতে বাধ্য হয়েছে। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান জাতীয়তাবাদও আর ঠিকঠাক মতো কল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। তার সার্থক রূপ হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

একটি জাতির সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের প্রতিফলন হিসেবে একটি পত্রিকা সক্রিয় পরিচায়কের ধারণায় ভূমিকা পালন করতে পারে, তার উদাহরণ *সমকাল*। ইতিহাসবোধ জাতির জন্য বিশেষভাবে জরুরি প্রপঞ্চ। সঠিক ইতিহাসবোধের সংকট যে কোনো রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। রাষ্ট্র নানাভাবে এর ফলে একটি জাতির মধ্যে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর এবং দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে, পত্রিকা জাতির পরিচয়ের বিস্তৃত ধারণায় অবদান রাখতে পারে। উপরিউক্ত প্রায় প্রত্যেকটি প্রপঞ্চ জাতীয়তাবাদী ধারণাকে শক্তপোক্ত করে তোলে। পাকিস্তানের নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রিক ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে স্বাজাত্যবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অস্ত্রের বিপরীতে অস্ত্র নিয়ে হয় যুদ্ধ। কিন্তু চিন্তাজগতের যুদ্ধও কোনো অংশে এক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরঞ্চ বলা যায় একটি অঞ্চলে, আরো বিশেষভাবে একটি রাষ্ট্রে, সমগ্র জনগোষ্ঠী যে একটি নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রকাঠামোর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই-সংগ্রামে লিপ্ত হয় তার মূলে চিন্তা-আদর্শগত দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করেন বুদ্ধিজীবীরা। *সমকাল* সামগ্রিক অর্থে এই ভূমিকা পালন করেছে।

উত্তরাধুনিক রাজনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রিক ধারণায় জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র ধারণার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার প্রবণতা চোখে পড়ে। কিন্তু এই বিষয় পশ্চিমের বহু দেশের ক্ষেত্রে যেমন কার্যকর থাকে তেমনি করে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রিক ধারণায় ততটা সম্ভব হয় না। উত্তরাধুনিক

জাতীয়তাবাদী চিন্তায় প্রথাগত জাতি ও জাতীয়তা– এই ধারণা দুটির বিপরীতে নতুন ধারণা, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক মূল্যমানকে বিবেচনা করা হয় গুরুত্বের সাথে। বৃহৎ বয়ানের বিপরীতে ক্ষুদ্র বয়ান-প্রকল্পকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই উত্তরাধুনিক রাষ্ট্র চিন্তার বিবেচনায়ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা খারিজ করার বিপরীতে সক্রিয়তায় কার্যকর থাকে। পরিশেষে এই বিষয় বলা যেতেই পারে যে, কোনো নির্ধারিত রাষ্ট্র বা ক্ষমতা-কাঠামোয় জনগণনির্ভর জাতীয়তাবাদ বদলে ফেলা যেতে পারে, কিন্তু যে সমস্ত বিষয় নিয়ে জাতীয়তাবাদ নির্মিত হয় তার কোনোটাই বদলাতে পারি না।

৬.

বিভিন্ন বিষয়ে লেখা একত্র করে তা *সমকাল* পত্রিকায় প্রকাশ করে সিকান্দার আবু জাফর পঞ্চশ-ষাটের দশকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় আন্দোলনকে কীভাবে ত্বরান্বিত করেছিলেন, সে সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা ও বিশ্লেষণ হলো। কিন্তু একটি পত্রিকা হিসেবে *সমকাল* কি এখনও ঐতিহাসিকভাবে সার্থক কিংবা সফল? কিংবা স্মরণযোগ্য? এই প্রসঙ্গে উত্তর দেওয়ার পূর্বে প্রথম যে প্রশ্ন এসে হাজির হয় তা হলো, 'একটি পত্রিকার কাজ কী?' কেবলই কি বিচিত্র ধরনের লেখা প্রকাশ করার মাধ্যমেই একটি পত্রিকার সামগ্রিক দায় মিটে যায়? উত্তর হবে: না। সাহিত্যকর্ম যা প্রকাশিত হচ্ছে তার যে মান ও গুণ তা রাষ্ট্রের বিবিধ আদর্শ-চিন্তা প্রতিপালনে বিশেষ ভূমিকা রাখে ঠিকই; কিন্তু একটি পত্রিকার আরও অনেক দায় আছে, একার্থে এই দায় মূলত সম্পাদকেরই থাকে।

প্রথমত, যে কোনো পত্রিকা যে ভৌগোলিক বাস্তবতায় প্রকাশিত হচ্ছে, সেই ভৌগোলিক বাস্তবতায় জীবন যাপন করছে এমন জনগণের জাতীয় পরিচয়কে লালন করে, মানবধর্মের আত্মীয়তার অনুভূতি প্রচার করে এবং সাংস্কৃতিক অনুভূতি প্রকাশের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পত্রিকা লেখক এবং পাঠকদের সমন্বিত অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবোধ ভাগ করার জন্য একটি ভালো জায়গা হিসেবে বিবেচিত হয়– যা আবার জাতির একটি সম্মিলিত বোঝাপড়ায় বৃহৎ অবদান রাখে। আমরা পূর্বের আলোচনায় বলেছি, সাহিত্য মানুষকে অন্যদের অভিজ্ঞতা বুঝতে এবং সহানুভূতিশীল হতে সাহায্য করতে পারে, এমনকি যারা তাদের থেকে আলাদা চিন্তা ধারণ করে, তারাও এর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। এটি নির্দিষ্ট জাতির মধ্যে সামাজিক সংহতি এবং সামষ্টিকবোধ নির্মাণ ও বৃদ্ধির জন্য একটি মূল্যবান হাতিয়ার হতে পারে। সাহিত্য, বিশেষ করে জাতীয় মহাকাব্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং দেশাত্মবোধক কবিতা-গান, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের মধ্যে চিন্তা-আদর্শগত আত্মীয়তা এবং একাত্মতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে, যা একটি সম্মিলিত জাতীয় চেতনা তৈরিতে বৃহৎ অবদান রাখে। সাহিত্যের বিচিত্র রূপ প্রকাশের মাধ্যমে পত্রিকা এই কাজ করে। কিন্তু কেবল একমাত্রিক ধারণা প্রভাবিত পত্রিকাগুলো বোধহয়

এ কাজে পারঙ্গম হয়ে ওঠে না। আর একইসাথে সাহিত্য একটি অঞ্চলের মানসম্মত ভাষা গঠনে, সেই সাথে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নথিভুক্তিকরণ এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পত্রিকা একটি জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির মূল্যবান সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে; এবং ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি লিপিবদ্ধ করে। এটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাদের অতীত সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদানেও সাহায্য করতে পারে। বৈশ্বিক বিবেচনায় পত্রিকা বিভিন্ন অঞ্চল এবং সংস্কৃতির লেখক এবং পাঠকদের জন্য একটি সেতুবন্ধরূপে কাজ করতে পারে, যা বৈশ্বিক পর্যায়ের বিভিন্ন লেখক-পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি বোঝাপড়ার সৃষ্টি করে। বৈশ্বিক বিবেচনার সাথে সাথে দৈশিক বিবেচনায় একটি জাতির সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং প্রচার করতে পারে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, পত্রিকা একটি রাষ্ট্রের 'সিভিল সোসাইটিকে' শক্তিশালী করে তোলে। উদীয়মান লেখকদের উৎসাহিত করার মাধ্যমে একটি পত্রিকা উদীয়মান লেখকদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে এবং তাঁদের স্বীকৃতি দান করে। এইভাবে একটি অঞ্চলের শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে লেখকদের অবদান রাখতে সহায়তা করে। বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সক্রিয় থেকে বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করাও একটি পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ; যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মতাদর্শের লেখকরা তাঁদের চিন্তা-আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করতে পারেন। কেউ কেউ প্রভাবশালী চিন্তা-আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন। যদিও 'সিভিল সোসাইটি' একার্থে সক্রিয় থাকে বিমূর্তভাবে, চিন্তাগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে। তারপরও একটি পত্রিকা কর্তৃক প্রদানকৃত প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত মুক্ত সংলাপ এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা একটি প্রাণবন্ত এবং পরস্পর সম্পৃক্ত নাগরিক সমাজ গঠনে অবদান রাখে। ফলে একই সময়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক জ্ঞানজগৎও তৈরি হয় এবং পশ্চিমে 'সিভিল সোসাইটি' রাষ্ট্র শব্দের পরিপূরক (আলথুসের, ২০২২, পৃ. ১০৬)। যাকে আমরা গণতান্ত্রিক চিন্তা-জগৎ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

এই সমগ্র আলোচনা শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় যে, একটি পত্রিকার যে সমস্ত প্রধান গুণ থাকা জরুরি, একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিবেচনায়, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় *সমকাল* পত্রিকা এর প্রতিটি দায়িত্বই দায়িত্বের সাথে পালন করেছে, উপরিউক্ত প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়েছিল। আদতে একটি পত্রিকার যা যা করা দরকার, তার প্রায় সবই করেছিল *সমকাল*, *সমকাল*-সম্পাদক সিকান্‌দার আবু জাফর।

৭.

সমগ্র আলোচনা শেষে নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে একটি বিশেষ সময়পর্বে সামগ্রিক অর্থে একজন বুদ্ধিজীবীর দায়বোধের বিষয়টি আলোচনায় চলে আসে। এই বিবেচনায় পঞ্চাশ, ষাট এবং সত্তরের দশকের অর্ধকাল সিকান্দার আবু জাফর প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর দায়বোধের ভেতরে প্রোথিত থেকে বুদ্ধিজীবীর পালনীয় প্রায় সকল কর্তব্য পালন করে বুদ্ধিজীবিতা বিষয়টিকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। কিন্তু 'সব মানুষ বুদ্ধিজীবী একথা প্রত্যেকেই বলতে পারে কিন্তু সমাজে সব মানুষ বুদ্ধিজীবীর কাজ করে না' (সাঈদ, ২০০৯, পৃ. ২১)। বার্ট্রান্ড রাসেল থেকে জুলিয়ান বেন্দা প্রমুখ বুদ্ধিজীবী প্রচলিত বুদ্ধিজীবিতা ব্যাপারটিকে বেশ নেতিবাচকতায় দেখেছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিজীবিতা কী এবং কেমন– সেটিও জানা যাক, সাঈদের মতে, 'বুদ্ধিজীবীরা হলেন বিপ্লবের পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, এমনকি ভাতিজি-ভাতিজা। তারা এককথায় বিপ্লবের প্রাণ' (সাঈদ, ২০০৯, পৃ. ২৩)। সিকান্দার আবু জাফর ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা তিনি 'বিপ্লবের পিতা-মাতার' মত করেই দৃঢ়চিত্তে সাহসিকতার সাথেই সম্পাদন করেছিলেন।

সহায়কপঞ্জি

অলিউল্লাহ্, কাজী মুহম্মদ। (২০১৩)। *সিকান্দার আবু জাফর*। হাতেখড়ি, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান। (১৯৬৯)। *মুসলিম বাঙলার সাময়িকপত্র [১৮৩১-১৯৩০]*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল হক। (১৯৭৩)। *বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। বইঘর, চট্টগ্রাম।

আবুল ফজল। (২০১৬)। *মানবতন্ত্র*। হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।

আলথুসের, লুই। (২০২২)। *রাষ্ট্র ও ভাবাদর্শ* [ভূমিকা, ভাবানুবাদ ও পর্যালোচনা: আলতাফ পারভেজ]। সংহতি, ঢাকা।

ইসরাইল খান। (১৯৯৯)। *পূর্ববাংলার সাময়িকপত্র*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বে-নজীর আহ্মদ (২০১৯)। 'স্মরণে'। *সমকালে রবীন্দ্রনাথ: সমকাল পত্রিকায় রবীন্দ্রচর্চা* [সম্পা. অনু হোসেন], বাতিঘর, ঢাকা।

মার্ক্স, কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক। (১৯৭০)। *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

মাহবুবা সিদ্দিকী। (১৯৯৩)। *সিকান্দার আবু জাফর: কবি ও নাট্যকার*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আল মাহমুদ। (১৯৮০)। *আল মাহমুদের কবিতা*। আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

ম্যাকাইভার, আর. এম.। (১৯৭৭)। *আধুনিক রাষ্ট্র* [এমাজউদ্দীন আহমদ অনূদিত]। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। (২০১৯)। 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক'। *সমকালে রবীন্দ্রনাথ: সমকাল পত্রিকায় রবীন্দ্রচর্চা* [সম্পা. অনু হোসেন], বাতিঘর, ঢাকা।

রবিউল ইসলাম। (২০১৫)। *সমকাল পত্রিকার সামাজিক ভূমিকা*। ঝিনুক প্রকাশনী, ঢাকা।

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ (২০১৯)। 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ'। *সমকালে রবীন্দ্রনাথ: সমকাল পত্রিকায় রবীন্দ্রচর্চা* [সম্পা. অনু হোসেন], বাতিঘর, ঢাকা।

শামসুর রাহমান। (২০১৭)। *শামসুর রাহমান রচনাবলি-প্রথম খণ্ড* [সম্পা. আবুল হাসনাত]। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সাঈদ, এডওয়ার্ড ডব্লিউ। (২০০৯)। *রিপ্রেজেন্টেশন্‌স অব দ্য ইন্টেলেকচুয়াল* (ভাষান্তর ও সম্পাদনা: দেবাশীষ কুন্ডু ও মাহবুবা নাসরীন)। সংবেদ, ঢাকা।

সাজ্জাদ হোসায়েন, সৈয়দ (২০১৯)। 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান'। *সমকালে রবীন্দ্রনাথ: সমকাল পত্রিকায় রবীন্দ্রচর্চা* [সম্পা. অনু হোসেন], বাতিঘর, ঢাকা।

সানাউল হক (১৯৯৮)। *সানাউল হক রচনাবলী-১* [সম্পা. বিশ্বজিৎ ঘোষ]। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সারওয়ার মুরশিদ, খান। (২০১৭)। *কালের কথা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯৯৫)। *সিকান্‌দার আবু জাফর রচনাবলী-১* [সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ]। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯৯৭)। *সিকান্‌দার আবু জাফর রচনাবলী-২* [সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ]। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Eliot, T. S.. (1949). 'A Notes on Culture and Politics', *Notes towards the Definition of Culture*. Faber and Faber, London.

Marx, Karl. (1853). 'The British Rule in India'. The New-York Daily Tribune, New York. Retrieved from: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/06/25.htm (Last Accessed: 16 May 2025).

Oppenheimer, Franz. (1922). *The State: Its History and Development Viewed Sociologically*. Vanguard Press, New York.

Raymond Williams. (1985). *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*. Oxford University Press, New York.

Trotsky, Leon. (1924). 'Proletarian Culture and Proletarian Art', *Literature and Revolution*. Retrieved from: https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/lit_revo/ (Last Accessed: 16 May 2025).